

মানি অর্ডারের টাকা

মূল অসমীয়া রচনা: সৈয়দ আব্দুল মালিক

অনুবাদ:

রঞ্জন কুমার ভট্টাচার্য

বান্ধবীরা মলয়াকে একপ্রকার টেনেই নিয়ে যায় ক্যান্টিনে। অবশ্য, মলয়াও খুব একটা বাধা দেয়নি, বরঞ্চ মনে মনে আনন্দই পেয়েছিল। ক্যান্টিনে তখন একদল ছেলেমেয়ে বসে চা খাচ্ছিল এবং সেইসঙ্গে হাসিঠাট্টার মাধ্যমে নানা গল্পগুজব করছিল। অন্যদিকে ক্যান্টিনের ম্যানেজারের পিছনের দিকে রেডিয়োতে বিবিধ ভারতীর মনমাতানো নানা গান চলছিল এবং লাউড স্পিকার থাকায় গানের আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছিল। মলয়া একাই বসেছিল। কিন্তু দীপা, পার্বতী, জাহানারা, মীনা ও অলকা একপ্রকার জোর করেই তাদের সঙ্গে এনে বসায়। পাশের ছেলেমেয়েরা মলয়াদের দেখছিল। কেউ একজন কিছু একটা প্রশ্নও করেছিল।

আরও কয়েকজন ছেলে এসে ঢুকল।

হু-একজন তাদের বিল মিটিয়ে চলে গেল। দীপা ক্যান্টিনের কর্মচারী ছেলেটাকে ডেকে চা, চপ ও পুডিং এর অর্ডার দিল।

অর্ডারের কথা শুনে পাশের টেবিলের ছেলেদের একজন বলল ‘আজ কিছু স্পেশাল নাকি? কে খাওয়াচ্ছে?’

‘মলয়া। ওর আজ হুটো খুব ভালো খবর আছে।’

‘সত্যি নাকি? খবরগুলো কী? ফাইনাল পরীক্ষা-পর্যন্ত ও আমাদের সঙ্গে থাকবে না নাকি?’

মলয়ার মুখ লাল হয়ে উঠল।

জাহানারা বলল, ‘এটা বলতে পারব না। তবে সত্যিকার অর্থেই আজ মলয়ার হুটো খুব ভালো খবর আছে।’

ছেলেরা মলয়ার দিকে তাকাল। মলয়া বুদ্ধিমতী মেয়ে। মাত্র কিছুদিন আগে গ্রামে নতুন কলেজ হয়েছে, আর ঐ কলেজ থেকেই বি.এ. পরীক্ষায় ডিস্টিংশন নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান দখল করে ইউনিভার্সিটিতে এসে নাম ভর্তি করিয়েছে। মলয়া দেখতেও সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। কথাবার্তায়ও খুব ভদ্র এবং অমায়িক। ইউনিভার্সিটির প্রায় প্রতিজন ছেলেমেয়ের সঙ্গেই সুসম্পর্ক, এমনকি ছেলেরা ঠাট্টাইয়াকি করলেও শান্তভাবে উত্তর দেয়। বাড়তি কোনও কথা বলে না।

‘ভালো খবরের অংশীদারি কি আমরা হব না?’ - একজন বলল।

‘কিছুই নয়’ - মলয়া উত্তর দেয়।

‘কিছু নয় মানে! মলয়া ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়েছে, এটা একটা ভালো খবর। অন্যদিকে আজ ভাইয়ের কাছ থেকে দেড়শত টাকা মানি অর্ডার এসেছে। মলয়া আজ আমাদের এমনি এমনি থাওয়াবার জন্য এনেছে নাকি?’

‘কনগ্র্যাচুলেশন- আমাদেরও থাওয়াতে হবে কিন্তু।’ ছেলেটা বলল।

মলয়ার মুখে শুধু নির্মল হাসি ফুটে ওঠে।

অলকা বললে, ‘মলয়া খুবই ভাগ্যবতী। সরকার টাকা দেয়, ভাইও টাকা দেয়। আমরা যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি এদিকে সরকারের কোনও খেয়ালই নেই। বাবা যদি টাকা না-পাঠাতেন তাহলে তো আজ পর্যন্ত মাথায় লম্বা ওড়না দিয়ে কারো বাড়িতে রাঁধুনি হতে হত।’

অলকা খুবই স্মৃতিবাজ মেয়ে, খোলামেলা কথা বলে। সবাই তাকে ভালো পায় আবার ভয়ও করে।

আলুর চপ এল।

‘চা নিয়ে আয়...’

‘আনছি দিদি’ - বলতে বলতে ক্যান্টিনের কর্মচারী পাতলা ছেলেটা দৌড়ে ভিতরে গেল।

পাশের টেবিলে বসে থাকা ছেলেদের মধ্যে একজন চ্যাঁচিয়ে বললে, ‘আমরা কি বসে থাকব নাকি?’

এতক্ষণ থেকে বসে আছি, আমাদের দিকে খেয়ালই নেই, তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়।’

‘আনছি’ - ভিতর থেকে ছেলেটা চিৎকার করে বলল।

অল্পক্ষণ পরেই ছেলেটা ট্রে-তে করে পুডিং ও চা এনে মলয়াদের টেবিলে রাখল।

কাছের টেবিলের ছেলেরা এদিকে তাকাল।

‘ও আমাদের দেখেইনি’- একজন বলল।

‘আনছি দাদা, আজ আসলে অন্যজন আসেনি, আমাকে একাই সবাইকে দিতে হচ্ছে।’

‘যা যা, আর বিশ্লেষণ করতে হবে না, চা নিয়ে আস-’

দীপারা হেসে হেসে মজা করে চা, চপ এসব খেতে লাগল। চা যে খুব একটা ভালো হয়নি এ কথাটাও আলোচনা হল।

‘ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনের চা আর কতটাই বা ভালো হবে।’ কথাটা পার্বতী বলল।

এদিকে রেডিয়োতে তখন দ্রুতলয়ের একটা গান বাজছিল, যার সুরে পরিবেশটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

এমন সময় হঠাৎ একটা কর্কশ স্বর শোনা গেল- ‘এই ছোঁড়া, আনছিস না কেন?

এখানে এভাবে আমাদের বসে থাকার সময় নেই। আমাদের অন্য কাজ নেই নাকি?’

যদিও তাদের বসার খুব বেশি সময় হয়নি, কিন্তু মেয়েরা বসে থাকবে, আর পাশের টেবিলে ক’জন ছেলে এমনিতে বসে থাকবে তাতে অবশ্য কিছুটা হলেও অস্বস্তি লাগবারই কথা।

আলুর চপ শেষ করে মেয়েরা ছোটো চামচ দিয়ে পুডিং খাওয়া শুরু করেছিল মাত্র। মলয়া শুধুমাত্র অল্প পরিমাণ মুখে দিয়েছিল, হঠাৎ একটা গগুগোল শুনে সবাই ওদিকে তাকাল।

‘স্টুপিড। শুধু শুধু চা ছ-কাপ দিতে ছ-ঘণ্টা লাগে, নবাবের ব্যাটা, কেয়ারলেস, স্কাউন্ডেল কোথাকার, ধামালি করছিস- গরম চা কাপড়ে ফেলে দিলি’- কথাটা বলেই ছেলেটা দাঁড়াল এবং কর্মচারী ছেলেটার হটো কান ঘেঁষে ঠাস করে একটা চড় কষাল।

ছেলেটা মাটিতে পড়তে পড়তে কোনোরকমে দাঁড়াল এবং কেঁদে কেঁদে বলল, ‘আপনি হঠাৎ করে ঘুরে গেলেন বলেই তো এরকম হল... আমি কী করব?’

ম্যানেজার উঠে এল। প্রথমেই ছেলেটাকে একটা থাপ্পড় মেরে ছেলেদের কাছে এসে সব দেখে বলল, ‘খারাপ পাবেন না, ওকে বিদায় দিতে হবে। গরিব ঘরের সন্তান, মায়া করে রেখেছিলুম। কিন্তু ওর মোটেই দায়িত্বজ্ঞান নেই।...এ-ই ওদের প্রত্যেককে একটা করে চপ দো।’

মেয়েদের সামনে চড় খাওয়ায় মনে মনে খুব লজ্জা পেল। মাথা নিচু করে কেঁদে কেঁদে ভিতরে চলে গেল।

জাহানারা ওরা সবাই চা, পুডিং খেয়ে শেষ করল। মলয়া পুডিং খেল না। মুখের কাছে নেওয়া চামচটাও রেখে দিল। গ্লাসের ঠান্ডা জল অর্ধেক পরিমাণ এক চুমুকে খেয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল।

চা শেষ করে দীপা বলল, ‘হোটেলের এই ছেলেরা একটা ওয়ার্থলেস। এককাপ চা দিতে একঘণ্টা সময় লাগে। ওর প্যান্টটাতো দিল নষ্ট করে...’

মলয়ার মুখে কোনও শব্দ নেই। বিলটুকু মিটিয়ে সবাই ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে পড়ল। মলয়ার একটা ক্লাস ছিল। কিন্তু ক্লাসে আর গেল না। ব্যাগ ও বইগুলো নিয়ে সিটি বাসের অপেক্ষা না-করে হেঁটে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

মলয়া গ্রামের এক গরিব পরিবারের মেয়ে। বাড়ির কাছে হাইস্কুল থাকায় বৃত্তির টাকায় পড়াশুনা করে প্রথম বিভাগে পাশ করে আবারও বৃত্তি লাভ করে এবং বাড়ি থেকে দেড়মাইল দূরে নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজ থেকে বি.এ.- ও ভালোভাবেই পাশ করে। গ্রামে ঐ কলেজ না-থাকলে মলয়ার পক্ষে কলেজে পড়া সম্ভব হত না। ইউনিভার্সিটিতে আসার আগে পর্যন্ত মলয়া তাঁতের মেখলা, গামছা ইত্যাদি বিক্রি করে পড়ার খরচ বের করেছিল। টেকিতে ধান কুটে চাল বের করতে হত। এর ফাঁকে গ্রামের কয়েকটা ছেলেমেয়েকে পড়িয়েও কিছুটা টাকার ব্যবস্থা করেছিল। খেতের সময় খেতের কাজও করতে হয়েছিল।

মলয়া পিতৃমাতৃহীন। মলয়ার দাদা অভাবের কারণে পড়াশুনা বেশি করতে পারেনি, খেতের কাজেই লেগে যায়। জমিও খুব বেশি নেই, তা থেকে সমস্ত বছরের খাওয়ারও ব্যবস্থা হয় না।

বড়ো কষ্ট, বড়ো অভাব।

এই অভাবের জন্যই মলয়ার ভাই কেশব সিন্ধু পর্যন্ত পড়াশুনা করে বাইরে চলে যায় রোজগারের উদ্দেশ্যে। বেশ ক’বছর হল, সে বাড়িতে আসেনি। অবশ্য প্রায়ই চিঠিপত্র দেয়। ছোটো অবস্থায় গিয়েছিল। এখন হয়তো বা অনেকটাই বড়ো হয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে মলয়া বাড়ি এসে পৌঁছল। ডা. বিভূতি দ্বারার বাড়ির ভিতরের লম্বা ঘরটার একটা কোঠাতে মলয়া থাকে। ঐ ঘরে বিশ্ববিদ্যালয়েরই আরও তিনজন ছাত্রী থাকে। তারা একসঙ্গে মেস করে খাওয়াদাওয়া করে।

মলয়া নিজের কোঠায় ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। প্রায় এক মাইল পথ হেঁটে এসে পরিশ্রান্ত বোধ হচ্ছিল।

মলয়া নিজের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। উপরে সাদা সিলিংফ্যানের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিছু সময় পর ব্যাগ থেকে একখানা চিঠি বের করে চোখের সামনে মেলে ধরল-

প্রিয় দিদি,

কয়েকদিন হল তোর চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল, খারাপ পাবি না। তুই যে বৃত্তির টাকা এখনও পাসনি, তা আমি বুঝতে পারিনি। তোর হাতে টাকা না-থাকায় হয়তো অনেক অসুবিধা হয়েছে। আমার হাতেও ঠিক ততটা টাকা ছিল না। কোনোভাবে নব্বই টাকা জমিয়েছিলাম। কিন্তু তোর টাকার দরকার জেনে আমার ম্যানেজারের কাছ থেকে অগ্রিম ত্রিশ টাকা নিয়েছি এবং আমার সস্পেন্সর আর এক কর্মচারী লোকনাথের কাছ থেকে আরও কিছু ধার নিয়ে আজ মোট দেড়শো টাকা মানি অর্ডার করে পাঠালাম।

দিদি, টাকার জন্য কোনও চিন্তা করিস না, আমি যেভাবেই হোক তোর জন্য টাকা পাঠাব। দিদি, হোটেলের কাজ খারাপ নয়। খাওয়াতো আমার এমনিতেই হয়ে যায়। কাজটাই যা একটু বেশি, ভোরবেলা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত খাটতে হয়। রাতে খুব পরিশ্রান্ত মনে হয়। আমার হোটেলের মালিক একজন পাঞ্জাবি লোক। লোকটা মন্দ নয়। মাঝেমধ্যে ধমক দিলেও আদরও করে। কিন্তু কিছু কিছু গ্রাহক খুব বাজে প্রকৃতির হয়। এসে অর্ডার দেওয়া মাত্রই চা, চপ, ভাত ইত্যাদি এনে দিতে হয়। নইলে গালি গালাজ করে, কখনও বা থাপ্পড়ও মারে।

দিদি, হোটেলের চাকরিতে এরকম হবেই। তুই মোটেই চিন্তা করবি না। চিরদিন কি আর এখানে চাকরি করব? তুই ভালো করে পরীক্ষায় পাশ কর। তখন তো বড়ো চাকরি পাবি। দরকার হলে না-হয় তখন আমি তোর ওখানে রান্নার কাজ করব।

দিদি, আমি বিড়ি-সিগারেট কিছুই খাই না। সিনেমাও দেখি না। এগুলো করলে তো তোর কাছে টাকা পাঠাতে পারব না। আগামী মাসে কত টাকা পাঠাতে হবে জানাবি। যেভাবেই হোক পাঠাব। তুই, ভালো করে পড়াশুনা করে পাশ কর। আমার জন্য মোটেই চিন্তা করিস না।

আমি ভালো আছি। শরীর অল্প খারাপ হলেও কাজ বন্ধ করি না। কাজ বন্ধ করলে বেতনের টাকা কেটে নেয়।

আশা করি তুই ভালো আছিস। আমার প্রণাম নিবি-

ইতি

তোর স্নেহের ভাই

কেশব

পু: আমার হাতের লেখা ভালো নয়, ভুলও হতে পারে। মোটেই হাসবি না কিছু।

-কেশব

ভাইয়ের চিঠি পড়া শেষ করে মলয়া একভাবেই বিছানাতে শুয়ে সিলিংফ্যানের দিকে তাকিয়ে রইল। বোনকে ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোর জন্য ভাই কেশব ছরের কোনও এক পাঞ্জাবি হোটেলে কর্মচারী হিসেবে কাজ করছে। হয়তো বা দেড়শো টাকা জোগাড় করতে কত গ্রাহকের ধমক খেয়েছে, খাপ্পড়ও খেয়েছে।

মলয়ার দৃষ্টিতে আজ ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনের চড় খাওয়া সেই ছেলেটা এবং কেশবের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সেও কি জানি হোটেলে কাজ করে কাউকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ জোগাচ্ছে।

মলয়ার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। এক অব্যক্ত বেদনায় মলয়া বালিশে মুখ গুঁজে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল

দরজাটা বন্ধ ছিল। বাইরের কেউ মলয়ার চোখের জল দেখতে পেল না।